মরীচিকা

(গল্পগ্রন্থ – মৌরীফুল)

কাল রাত্রে গ্রামের লোকের ঘুম হয় নাই ভাল।

আজই চাটুয্যে-গিন্নির নাতনিকে দেখিতে আসিবার দিন। গ্রামসুদ্ধ মেয়েপুরুষ সেখানে আজ নিমন্ত্রিত।

কিন্তু শুধু নিমন্ত্রণের আনন্দই যে এদের ঘুম না হইবার একমাত্র কারণ, তাহা নয়। ছোট্ট গাঁ, সবসুদ্ধ ঘর পঞ্চাশেক লোকের বাস। কেহ বিদেশে যায় না, চাকুরি করে না, করিবার দরকারও নাই। সামান্য জমিজমাটুকু নাড়িয়া চাড়িয়া প্রত্যেকে একরকম দিনপাত করে। কুলবেড়ে গ্রামের বাহিরে যে বড় জগৎটা আছে, সে-সম্বন্ধে কেহ কিছু জানেও না, জানিবার জন্য মাথাও ঘামায় না।তাই কাল যখন জানা গেল, চাটুয্যে-বাড়িতে মেয়ে দেখিতে যে আসিতেছে সে কলকাতার ছেলে ও কলেজে শিক্ষিত, তখন এই অদৃষ্টপূর্ব জীবটিকে দেখিবার ও তাহার সহিত কথাবার্তা কহিবার আনন্দটা, খাওয়ার আনন্দকেও ছাপাইয়া উঠিল। তাছাড়া যে বর, সে-ই স্বয়ং আসিতেছে নিজের চোখে পাত্রী দেখিতে—আজকালকার ছেলের তাই ধরন। রেলের স্টেশনে শেষরাত্রে গরুর গাড়ি গিয়াছে। বেলা দশটার মধ্যে এখানে পৌঁছাইয়া যাইবে। রায়-বাড়ির চণ্ডীমণ্ডপে একদিকে ভূষির বস্তা ও বিচালীর স্তূপ সরাইয়া নতুন মাদুর পাতিয়া বসিবার জায়গা করা হইয়াছে, কারণ চাটুয্যে-বাড়িতে বাহিরের বসিবার ঘর নাই। পাত্রকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য গ্রামের শখের যাত্রাদলের ছেলেরা কয়দিন হইতে গান-বাজনার তালিম দিয়াছে; একটি ছোক্‌রা মামার-বাড়ি বেড়াইতে গিয়া কলের গানে রিজিয়া ও বক্তিয়ারের অভিনয় শুনিয়া মুখস্থ করিয়াছিল—গ্রামের আবাল বৃদ্ধ বনিতাকে বহুবার শুনাইয়াছে—আজ সেও একবার কৃতিত্ব প্রদর্শনের জন্য অধীর হইয়া আছে।

সকাল হইতেই চণ্ডীমণ্ডপে লোকজনের জটলা। তাহারা ঘনঘন তামাক খাইতেছে ও নানাবিষয়ে গল্পগুজব করিতেছে। বিশ্বাস-মহাশয়ের এক দূর-সম্পর্কের ভাই কলকাতায় কোন্ গদীতে বিল-সরকারের চাকুরি করিতে—কলকাতার গল্প বিশ্বাস-মহাশয় তাহার মুখে অনেকবার শুনিয়াছেন—সম্প্রতি তিনি তাহাই মুগ্ধ ও কৌতূহলী শ্রোতৃমণ্ডলীর সম্মুখে বলিতে ছিলেন।

পাঠশালার গুরু নিতাই সামন্ত আঙুল দিয়া দেখাইয়া বলিল—ঐ যে গরুর গাড়ি ফিরেছে— বাঁশ-ঝাড়ের আগালে পড়ে' জুলির পথটা বুজে গিয়েছে কিনা, তাই ঘুরে আসছে বোধহয়।

সকলেই গরুর গাড়িটা দেখিল, কিন্তু কেহই বিশ্বাস করিল না যে পাত্র আসিতেছে। গরুর গাড়িটা ঘুরিয়া পিছনের পথ দিয়া আসিতেছিল, কেহই দেখিতে পাইল না ছই-এর মধ্যে লোক বসিয়া আছে কিনা।

মিনিট পাঁচ ছয় পরে। কলেজের ছেলেটি আসিয়া মাদুরে বসিয়াছে, তাহাকে ঘিরিয়া রথযাত্রার ভিড়। ছেলেটির বয়স তেইশ চব্বিশ কি এক-আধবছর বেশী, রং ফরসা, গায়ে মট্‌কার পাঞ্জাবি ও চাদর, চোখে চশমা। সে বৃদ্ধ বিশ্বাস-মহাশয়ের কাছে প্রথম ট্রেনটা ফেল হইবার গল্প করিতেছিল। সবাই হাঁ করিয়া শুনিতেছিল।

প্রথমে যদু ভড়ের কীর্তনগান শুরু হইল। তারপরে দুলাল মুখুয্যে শ্যামাবিষয়ে গাহিলেন।একজন বেহালা বাজাইল। তারপরেই রিজিয়া ও বক্তিয়ার।

গ্রামের সাতকড়ি মুখুয্যে এইবার তাঁর ছেলে তিনটিকে সঙ্গে লইয়া চণ্ডীমণ্ডপে উঠিলেন। সাতকড়ি লেখাপড়া আদৌ জানেন না, গোলার ধানে সম্বৎসর চলিয়া যায়—সুতরাং চাকুরির ধারও ধারেন না, কিন্তু তাঁর ঝোঁক গান-বাজনার দিকে। পাঁচটি ছেলের একটিকেও লেখাপড়া শেখান নাই, গান-বাজনা শিখাইয়াছেন, এবং যে-সব গ্রাম্যমজলিসে অন্য গ্রাম হইতে দু'পাঁচজন বাহিরের লোক আমদানী হয়, সে-সব স্থানে ছেলে কয়েকটিকে সঙ্গে লইয়া একখানা কম দামী বেহালা হাতে সাতকড়ি গিয়া হাজির হন।

ইনি আসন গ্রহণ করিয়াই সেজ ছেলে বসন্তকে বলিলেন—বাবা, রজনের থলিটা আনতে ভুল হয়ে গিয়াছে—একবার দৌড়ে যাও তো বাড়ি—চালির মুড়োয় তোলা আছে।

বসন্ত অপ্রসন্ন মুখে পৈঠা দিয়া নামিয়া গেল।অন্য সময় হইলে সে বাবাকে দু'কথা শুনাইত—কিন্তু নবাগত শহরের শিক্ষিত ভদ্রলোকের সম্মুখে তাহার সাহসে কুলাইল না।

—গেনু (বসন্তের ডাক নাম) আজকাল যা কীর্তন গায়, চমৎকার। রাসু অধিকারীর গাওনা তো শুনেছি ঘেঁট্‌গাছির বারোয়ারীতে—তার চেয়ে কম নয়। আমার ছেলে বলে বলছি যে পদ্ম খুড়ো, তা নয়! রজন্‌টা ফেলে এসে মুশকিল হোল কিনা!শোনাচ্ছি একখানা, আসুক।

পদ্মলোচন চক্রবর্তী গ্রামের পুরোহিত—তিনি গান-বাজনা বিশেষ বোঝেন না, তবুও সাতকড়িকে খুশী করিবার জন্য বলিলেন—আহা হীরের টুকরো ছেলে তোমার বসন্ত। ওর গলা আর শুনিনি আমি?...কোজাগরী পুজোর দিনে মহিমদার বাড়িতে গাইলে—আহা, যেমন গলা তেমনি তাল-বোধ।

সাতকড়ি ছেলে তিনটিকে চারিধারে বসাইয়া নিজে মধ্যে বসিলেন। ইতিমধ্যে রজন্আসিয়াছিল, গান শুরু হইল।

—আর একটু ঠায়ে ধর বাবা...

বলিয়া সাতকড়ি গর্বিত হাসিমুখে ও প্রশংসমান দৃষ্টিতে কীর্তনগানরত পুত্রের দিকে একবার চাহিয়া আবার চারিধারে চাহিতে লাগিলেন। গান একে একে অনেকগুলি হইল। সাতকড়ি বড় ছেলেকে একবার ফরমায়েশ করিয়া বলেন—মানু, গা তো সেই "ওগো শ্যাম গুণমণি?"...বড় ছেলের শেষ হইলে আবার সেজ ছেলেকে ফরমায়েশ করিতেছিলেন—ধর দিকি বাবা "মম মানস শুক পাখি?" অনেকদিন শুনিনি তোর মুখে। কৈলেস খুড়ো, একটু ঠেকা দিয়ে যাও না, ভাল গানখানা...

সাতকড়ি ছেলেদের লইয়া আসিবার পরে আসরে আর কেহ আমল পান নাই। সাতকড়ি নিজের ছেলেদের নিজে বাহবা দিয়া, হাসিয়া, চোখ বুজাইয়া, ঘাড় দোলাইয়া, ফরমায়েশ করিয়াএমন জমাইয়া তুলিলেন যে আর কাহারও আমল পাইবার যো ছিল না।

খানিকটা পরে আগন্তুক শহরে-ছেলেটি কি কথায় কথায় কলেজের গল্প তুলিল।সে নূতন কলেজে ভর্তি হইয়াছে, বয়স অল্প, দেখিতে সুশ্রী। এ ধরনের অজ পাড়াগাঁয়ের লোকজনের মাঝখানে কথা বলিয়াও সুখ আছে। তাহার ইংরাজী বুক্নি-মিশানো কথাবার্তায় সাতকড়ি ভয় খাইয়া গেলেন। ছেলেটি বলিতেছিল—এ সব পাড়াগাঁয়ে সে-সব কেই বা বোঝে?...এডুকেশন না থাকলে কি একটা জাত কখনো উঠতে পারে?...কলেজে আজকাল মেয়েরা পড়ছে—এম্-এ, বি-এ পর্যন্ত পাস করছে—সে-সব দিন কি আর আছে?...দেখে আসুন একবার কলকাতায়। গিয়ে।

মেয়েদের এত লেখাপড়ার কথা এ-গ্রামে কেহ শোনে নাই। কৈলাস ভট্চায বিস্ময়ের সুরে বলিলেন—মেয়েরা এম্-এ, বি-এ পাস দিচ্ছে? বলো কি বাবাজী! কই এ-কথা শুনিনি তো?...

—এ পাড়াগাঁয়ে বসে শুনবেন কোথা থেকে? ছেলেরা যেখানে কখনো স্কুলের মুখ দেখেনি, সেখানে মেয়েদের লেখাপড়ার কথা তো ভাবতেই পারবেন না।

ও-দিকে সাতকড়ি মুখুয্যে একটু অপ্রতিভ হইলেন।শুধু অপ্রতিভ নয়, কোথায় যেন তিনি নিজেকে অপমানিত বিবেচনা করিলেন। পাঁচ পাঁচটি ছেলের কোনোটিকেই তিনি লেখাপড়া শেখানোর কোনো চেষ্টা করেন নাই—গান-বাজনা শিখিলে ভদ্রসমাজে, মজলিসে সর্বত্র সম্মান ও গৌরবলাভ করা যাইবে—এতদিন তিনি ইহাই জানিয়া আসিয়াছেন, ছেলেগুলিকে সেই অনুসারেই মানুষ করিয়াছেন। কুলবেড়ের বাহিরে বড় জগৎটাতে যে অন্য ধরনের হিসাব-নিকাশ প্রচলিত, তাহাদের খোঁজও তিনি জানিতেন না।

তিনি নিঃশব্দে তার বেহালাখানা খেরোর খাপের মধ্যে পুরিলেন, রজনের থলিটা সবার অলক্ষ্যে বড় ছেলের হাতে তুলিয়া দিলেন।

একটু পরে জলযোগের ডাক পড়িল।

ইহাও কেবলমাত্র ভাবী পাত্রের জন্য নহে, গ্রামস্থ সকল নিমন্ত্রিত ভদ্রলোকের জন্য। ছেলেটি এই প্রথম পাত্রীর বাড়ি দেখিল। দেখিয়া একটু নিরাশ হইল। চার পাঁচখানি খড়ের বড় বড় ঘর, সামনের উঠানে বড় বড় গোটাকতক গোলা, দক্ষিণে একটা পুকুর, একটা বাতাবীলেবু গাছ ও গোটাকতক নারিকেল গাছ। পাত্রীর দিদিমা বাড়ির কর্ত্রী; তিনিই গ্রামসুদ্ধ সকলকে আদর করিয়া বসাইলেন, জলযোগের ব্যবস্থা করিলেন।

ক্রমে বেলা চড়িয়া গেল।মধ্যাহ্নভোজন মিটিতে দুইটা বাজিল। ছেলেটি একটু অবাক হইল ইহাদের ভোজনের পরিমাণ দেখিয়া। একটা পনেরো বছরের বালকও যাহা খাইল, তাহা তার নিজের তিন বেলার খোরাক।

বেলা যখন পাঁচটা, তখন কৈলাস ভট্‌চায আসিয়া বলিলেন—বাবাজী ওঠো একবার, মেয়েটিকে দ্যাখো।বাবাজীই বলি, তোমাদের সঙ্গে তো সম্পর্কই বাধলো, মেয়ে দেখে অপছন্দ হবে না।তবে এ তো শহর বাজার নয়, একটু আধটু যা ত্রুটি, তা তোমাকে শুধরে নিতে হবে বৈকি। এসো বাবাজী!

আবার চাটুয্যে-বাড়ির চণ্ডীমণ্ডপে অনেক লোক জড়ো হইয়াছে। গতিক দেখিয়া মনে হয়, অদ্যকার মত একটা উৎসবের ব্যাপার ইহাদের গ্রামে অনেককাল ঘটে নাই। অন্ততঃ আগন্তুক ছেলেটির তাহাই মনে হইল; নতুবা গৃহস্থ-বাটিতে মেয়ে-দেখানো-রূপ সামান্য ব্যাপারে গ্রামসুদ্ধ লোকের এত উৎসাহ কেন?

মেয়ে দেখিয়া ছেলেটি সন্তুষ্ট হইল। বেশ স্বাস্থ্যবতী, রং খুব ফরসা না হইলেও মানান্‌সই—মুখশ্রী সুন্দর, বড় বড় চোখ। কেবল ইহাদের চুল বাঁধিবার ধরন সে পছন্দ করিল না। পাতা-কাটা খোঁপা শহর হইতে কোন্ কালে উঠিয়া গিয়াছে, আর ইহারা সেটাকে এখনও ফ্যাসান বিবেচনা করে! তা ছাড়া অত গহনা কেন গায়ে? গহনার ভারে মেয়েটি যেন বিব্রত হইয়া পড়িয়াছে!

দিদিমা সজল চোখে বলিলেন—ওকে নাও গিয়ে দাদাভাই। ও আমার যেমন মেয়ে তেমন মেয়ে এদিকে নেই, এ আমি বড় গলা করে বলতে পারি। ওরা আমাকে ফাঁকি দিয়ে চলে গেল, মেয়ে তখন তিন মাসের—সেই থেকে আমার কাছে মানুষ। আমারও তো ও-ছাড়া আর কেউ নেই, ওর বাবা কোনো খোঁজ নেয় না; সে আবার বিয়ে করেছে ছেলেপুলেও হয়েছে, সেএ-দিক-মাড়ায় না। তোমার হাতে মেয়েটাকে তুলে দিয়ে নিশ্চিন্দি হই—তারপর যা রইলো সবই তোমাদের। কর্তারা যা করে রেখে গিয়েছেন, তাতে চাকরি করে খেতে হবে না, আমাদের বাড়িতে চাকরি কখনো কেউ করে নি।

কৈলাস ভট্‌চায বলিলেন—এ গাঁয়ে কখনও কেউ চাকরি করেছে বউ-ঠাক্‌রুণ?আপনাদের কর্তাদের কথা তো বাদই দিন, তাঁরা তো ছিলেন গাঁয়ের মালিক, মাথার মণি—আমাদের কর্তারা, কি আমরা কখনো গাঁয়ের বাইরে অন্নের চেষ্টায় পা বাড়িয়েছি? রামোঃ! এই যে দেখছো বাবাজী উত্তরে মাঠ এ সব লাখ্‌রাজ, একেবারে সেই রতনপুরের নীলকুঠী পর্যন্ত। তবে এদের বাড়িতে পুরুষ মানুষ নেই, একা বউ-ঠাকরুণ আছেন, মেয়েমানুষ—তাই চাষবাস হয় না। নইলে ষাট সত্তর বিঘে খাসে আমন ধানের জমি রয়েছে, দুটো বড় পুকুর রয়েছে—চাষ করলে ভাবনা কিসের?এই দেখছো বটে খড়ের ঘর, এ গাঁয়ে সকলেই এঁদের প্রজা।

ছেলেটির নাম সুরেন। আহারাদির পরে সে বাড়ির চারিধারে ঘুরিয়া দেখিল। কলকাতায় থাকিবার আজকাল বড় কষ্ট, পড়াশুনা শেষ করিয়া চাকুরির বাজারও সুবিধা নহে—যদি এখানে বিবাহ করিয়া সম্পত্তি পাইয়া বাস করা যায়, এ পল্লীগ্রামের শান্তি ও নির্জনতার মধ্যে শহরের উগ্র জীবন-সংগ্রাম হইতে বেশ দূরে, নিশ্চিন্ত ভাবে চমৎকার জীবন কাটিবে এখন।

সুরেন জিজ্ঞাসা করিল—আচ্ছা, এ জমিটা পড়ে আছে কেন ভট্‌চায্যি মশায়?

—ওই যে তোমাদের বল্‌লাম বাবাজী, এদের বাড়িতে চাষ করবার মানুষ কই? বুড়ী একা তো সব দিক দেখতে পারে না। তোমার সঙ্গে যদি বিধাতা যোগাযোগ ঘটিয়ে দেন, তবে তুমিই এসে সব নিজের হাতে নাও না? তোমায় তা হোলে কি কারুর চাকরি করতে হবে! পায়ের ওপর পা দিয়ে চাটুয্যেদের সাত পুরুষ এই ভিটেতে দুধ-ঘি খেয়ে কাটিয়ে গিয়েছে, তোমারও কাট্‌বে।

সুরেন নিজের মেসের কথা ভাবিতেছিল। জানালাহীন ছোট্ট ঘরটার কথা ভাবিল—হাওয়া কোনো কালে খেলে না, গরমে অর্ধেক দিন রাত্রে ঘুম হয় না। এতটুকু এক টুক্‌রো মাছ, বিস্বাদ ডাল, ততোধিক বিস্বাদ তরকারী—একদল লোক খাইয়া উঠিয়া গেলে তাহাদের উচ্ছিষ্ট ভাল করিয়া না ধুইয়াই তাহার উপর আর একদল লোক খাইতে বসিয়া যায়, দেওয়ালের গায়ে আরসোলা চলাচল করে—সব কথা ভাবিয়া দেখিল।

এখানে এই মুক্ত মাঠের ধারে স্বাধীন জীবন--নিজের লোকজন, নিজের হুকুমমত সকলকে খাটানো।সে দরিদ্র ঘরের ছেলে, এ-সব তো তাহার কাছে স্বর্গের মতই নাগালের বাহিরের জিনিস।

মন্দ কি? আইন পাস করিয়া কি হইবে? এই তো বেশ!

মহা উৎসাহে সে ভট্‌চায্যি-মশায়কে বিষয়-আশয় সংক্রান্ত আরও প্রশ্ন করিতে লাগিল। কলমের বাগানগুলো কোন্ দিকে? প্রত্যেকটাতে কতগুলা করিয়া গাছ? পুকুরগুলা কি মাছ ছাড়িবার উপযুক্ত আছে?

বেলা খুব পড়িয়া আসিয়াছিল। নিকটের বিলের ধার হইতে চরিয়া গরুর দল কর্দমাক্ত গায়ে বাড়ি ফিরিতেছিল। সান্ধ্য হাওয়ায় তালগাছে বাবুই পাখীর বাসা দুলিতেছে ও শুক্‌না তালপাতার খড়্‌মড়্ শব্দ হইতেছে।

সুরেন একা একটু বেড়াইবার জন্য দক্ষিণের মাঠের রাস্তাটা ধরিল। কৈলাস ভট্‌চায এবার সঙ্গে আসেন এটা সে চায় না; কিন্তু ভট্‌চায মশায় খোশগল্পের শ্রোতাকে অত সহজে ছাড়িয়া দিতে রাজী নহেন। তিনিও সঙ্গে সঙ্গে চলিলেন।

—শুধু রত্নপুরের খড়ের মাঠটার শালিয়ানা তিনশো টাকা আয় ছিল বাবাজী। বাঁড়ুয্যেগিন্নি তো বোঝেন না, ওঁকে ঠকিয়ে সেটা বারো ভূতে খাচ্ছে। তুমি দেখে শুনে খাসে আদায় করবে, শিখিয়ে দিলাম তোমায়।

সন্ধ্যার পরে আবার অনেকে চণ্ডীমণ্ডপে জড়ো হইল।

সুরেন এবার যেন এখানকার এই সকল আনন্দস্রোতে নিজেও ভাসিয়া গেল। সাতকড়ির বেহালা দু'তিনবার ফরমাইশ করিয়া শুনিল, তাঁর ছেলের কীর্তনের তারিফ করিল।

সাতকড়ি বলিল—গাঁয়ের সব ছেলেরা আমায় ধরেছে, তোমায় বলতে সাহস করে না, বাবাজী, এবার ওরা একটা শখের দল খুলছে, তোমায় কিছু চাঁদা দিতে হবে।

তিনি আরও কি বলিতে যাইতেছিলেন, এমন সময়ে একটি লোক হাসিমুখে চণ্ডীমণ্ডপে উঠিয়া হাত তুলিয়া সকলকে নমস্কার করিল।

সাতকড়ি বলিলেন—এসো মাস্টার বসো।স্কুল ছেড়ে দিয়ে এলে?সুরেন বাবাজী, এঁর সঙ্গে তোমার আলাপ নেই, ইনি পাশের গাঁয়ে স্কুল খুলেছেন; খুব ভালো মাস্টার, নিভাননীকে ইনি একবেলা ইংরাজী পড়ান।

মাস্টার সুরেনের দিকে চাহিয়া দাঁত বাহির করিয়া হাসিল। তাহাকে দেখিয়া সুরেনের মনে বিশেষ ভক্তির উদ্রেক হইল না। এমন তেল মাখিয়াছে যে কানের পাশ গড়াইয়া পড়িতেছে, মুখ পানে লাল, বোকার মত হাসিটা। হাঁ, ইংরাজীর অধ্যাপক বটে! ভাবী পত্নীর ইংরাজী শিক্ষাটা হইতেছে ভালই। মাস্টার জুটিয়াছে যখন এমন!

মাস্টার বসিয়া বসিয়া বক্‌বক্ করিতেছিল। নিজের কৃতিত্ব ব্যাখ্যা করিবার সুযোগ কে ছাড়ে? কি করিয়া নিভাননীকে অক্ষর চিনাইল, কি করিয়া এ-বি-সি লিখিতে শিখাইল সেই সব বলিল। মাস্টারের কথা শুনিয়া সুরেনের মনে হইল—ফার্স্টবুকের ঘোড়ার গল্প তার ইংরেজী-ভাষাজ্ঞান-রূপ সৌধের সর্বোচ্চ। অতএব ছাত্রীর বিদ্যা কিরূপ হইয়াছে, তাহা সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে।

কিন্তু কি করিবে সে! এই দূর পাড়াগাঁয়ের অশিক্ষিতা মেয়েকেই জীবন-সঙ্গিনী করিয়া লওয়া ছাড়া গত্যন্তর নাই। মেসের দেনা মিটাইতে না পারিলে আগামী মাসে ছাড়িতে হইবে—চারিধারে বন্ধুবান্ধব-মহলে দেনা, দেনা! কলকাতায় আর কতদিন টিকিয়া থাকা চলিবে?

ভাগ্যে সে এই মেয়েটির বাপের এক বন্ধুর নিকট হইতে মেয়ের সন্ধান পাইয়াছিল! তিনিও তাহার মেসেই থাকেন। তাঁহার চিঠি লইয়াই সে এখানে আসিয়াছে মেয়ে দেখিতে। পাল্‌টি ঘর, দেখিতে সুশ্রী, কলেজে পড়াশুনা করিতেছে—ইহাদেরও আপত্তি হইবার কথা নয়।

কিন্তু একটা গোলমাল আছে।

সে-কথা এখনও পর্যন্ত সে কাহাকেও বলে নাই, কারণ কেহ তাহাকে জিজ্ঞাসা করে নাই। সে অতি দরিদ্র, তাহার নিজেদের ঘরবাড়ি পর্যন্ত নাই, তাহার বাবা চিরকাল শ্বশুরালয়ে বাস করেন, সেকালের ঘরজামাই। ইঁহাদের কথাবার্তায় সে বুঝিতেছে যে শিক্ষিত ও শহুরে পাত্রের হাতে মেয়ে দিলে মেয়ে শহর-বাজারে বাসায় থাকিবে, গাড়ি-ঘোড়া চড়িবে, গহনাগাঁটি পরিবে—ইহা মেয়ের দিদিমার একটা সাধ এবং সম্ভবতঃ মেয়েরও।

কিন্তু তাহার দ্বারা কোনো সাধই যে পূর্ণ হইবার নহে, সেই কথা খুলিয়া বলা হয় নাই। সে বন্ধুবান্ধবদের নিকট হইতে কাপড়জামা, চশমা ধার করিয়া আনিয়াছে বলিয়া ও চেহারাটা সুশ্রী বলিয়া উহাদের পক্ষে ধরিয়া লওয়া স্বাভাবিক যে সে অবস্থাপন্ন গৃহস্থ ঘরের ছেলে। ইহারা সন্ধান করিয়াও আসল ব্যাপার বাহির করিতে পারিত না : কারণ তাহার মামারা সত্যই অবস্থাপন্ন। তাহার পিতামাতা ও ভাইবোনের সে-বাড়িতে স্থান যে বাড়ির চাকর-বাকরের চেয়েও নিচু, তাহা ইহারা বাহির হইতে বুঝিতে পারিবে কি—বিশেষতঃ, এই ধরনের সরল প্রকৃতির লোক এরা!

নানা দিক ভাবিয়া সে এখানে আসিয়াছিল। মেসের ভদ্রলোকটির মুখে সে সবই শুনিয়াছে।মেয়ে-জামাই এই সম্পত্তির উত্তরাধিকারী দাঁড়াইবে, সত্য বটে। সে এখন নয়, বৃদ্ধার মৃত্যুর পরে যদিও—তবুও সারাজীবনের অন্নসমস্যার মীমাংসা বিবাহের সঙ্গেই হইয়া যাইবে।

কিন্তু সে যদি অবস্থা গোপন করিয়া বিষয়ের লোভে এখানে বিবাহ করে, যদি সে কাহাকেও কিছু না ভাঙে, হয়তো ইহারা কোনো অনুসন্ধান করিবে না তাহার বিষয়, হয়তো বিবাহ হইয়া যাইবে। কিন্তু সে কাজের পরিণাম ভাল নয়। ইহার পর স্ত্রী পর্যন্ত তাহাকে অশ্রদ্ধা করিবে।

রাত্রে সুন্দর জ্যোৎস্না উঠিল। নবীন পল্লীপ্রকৃতি একটি রহস্যাবৃত সৌন্দর্যের কুয়াশায় নিজেকে আবৃত করিয়াছে। সারা রাত সে ঘুমাইতে পারিল না।

অত্যন্ত সহজেই এ বাড়ি এই গ্রামের মাঠ, বন, তাহার আপনার হইতে পারে।

কি করিবে সে?...

পরদিন সকালে উঠিয়া সে যাত্রার জন্য প্রস্তুত হইল। কিন্তু সেদিন সকালে কৈলাস ভট্‌চায তাহাকে নিজের বাড়িতে যাইতে বলিয়াছিলেন—সুরেনের আপত্তি তিনি শুনিলেন না। বলিলেন—বাবাজী, ভারী তো খাওয়াবো, দুটো মাছের ঝোল ভাত—তার জন্যে কি তোমার ট্রেন ফেল্ করাবো আমি! সব সকাল সকাল হয়ে যাবে এখন। গাড়ি ধরিয়ে দেবার ভার আমার ওপর। তুমি এখন থেকে আপনার জন হতে চললে, দুটো না খাইয়ে কি ছেড়ে দিতে পারি?

খাওয়ার আয়োজন সকাল সকালই হইল। দুধ, মাছ, দই সব চাটুয্যে-বাড়ি হইতে পাঠাইয়া দিয়াছে। তাহাদেরই পুকুরে শেষরাত্রে মাছের জন্য জাল ফেলা হইয়াছিল। চাটুয্যে-গিন্নীও উপস্থিত ছিলেন, কাছে বসিয়া যত্ন করিয়া খাওয়াইলেন। ছেলেটিকে সত্যই তাঁহার ভাল লাগিয়াছিল। দেখিতে সুশ্রী, বুদ্ধিমান, অমায়িক—লেখাপড়া জানা তো বটেই। নিভাননীর অদৃষ্টে এখন এমন বর জুটিলে তো! তেমন কপাল কি সে করিয়াছে!

গরুর গাড়িতে উঠিবার সময়ে তিনি পথে খাইবার জন্য গাড়িতে ডাব, পেঁপে ও আম তুলিয়া দিলেন। বাড়ির একজন চাকর সুরেনকে জিনিসপত্র সমেত ট্রেনে তুলিয়া দিতে যাইবে, ঠিক হইল।

চাটুয্যে-গিন্নী সুরেনের হাতদুটি ধরিয়া বলিলেন—দাদাভাই, এ কাজ যাতে বোশেখ মাসের মধ্যে হয় তা তোমাকে করতেই হবে। নিভাননীকে তোমায় নিতেই হবে। দেখে শুনে তো সবই গেলে, তোমার বাবাকে গিয়ে পাঠিয়ে দিও, এসে মেয়ে আশীর্বাদ যেন করে যান। আমায় কথা দিয়ে যাও, যে এতে তোমার অমত নেই। গিয়েই পত্তর দিও দাদা...

সুরেন চলিয়া গেলে দিনকতক গ্রামে তাহার সম্বন্ধে আলোচনা চলিল এবং সাতকড়ি ছাড়া অন্য সবাই ছেলেটিকে খুব পছন্দ করিয়াছে।কৈলাস ভট্‌চায তো সকলের কাছে তাহার শতমুখে প্রশংসা করিয়া বেড়াইলেন।

একদিন করিয়া সপ্তাহ খানেক কাটিয়া গেল। সুরেনের কোনো পত্র বা সংবাদ কিছুই আসিল না। চাটুয্যে-গিন্নী অত্যন্ত ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন। ক্রমে দিন বারো কাটিল। কোনো খবর নাই। চাটুয্যে-গিন্নী সুরেনের ঠিকানায় কৈলাস ভট্‌চাযকে দিয়া লিখাইয়া রেজস্ট্রি পত্র দিলেন।

আরও দিন কতক কাটিল, সে-পত্রের কোনো জবাব আসিল না।

চাটুয্যে-গিন্নী কৈলাস ভট্‌চাযের কাছে আসিয়া কাঁদিয়া পড়িলেন। কৈলাসের নিজের বড় ছেলে রাম, পাশের গ্রামের নবীন কাপালির সঙ্গে দিনকতক ভাগে কাঁঠালের ব্যবসা করিয়াছিল : বার তিনেক কাঁঠালের চালান লইয়া কলকাতায় গিয়াছিল : সুতরাং তাহাকেই সুরেনের বাসার ঠিকানা দিয়া কলকাতা পাঠানো হইল।

তিন দিন পরে রাম ফিরিল। কলকাতার মেসের সেই বাবুটি একখানা পত্র দিয়াছেন, সেখানা সে বাবার হাতে দিয়া চুপ করিয়া রহিল।

কৈলাস পত্রখানা খুলিয়া পড়িলেন। সুরেন বাঁচিয়া নাই। এখান হইতে ফিরিয়া দিনকতক পরে সে নিজের দেশে অর্থাৎ মামার বাড়িতে যায় পিতার সঙ্গে সব কথা খুলিয়া বলিতে, সেখানে কলেরা হইয়া মারা গিয়াছে।

সময় কাহারও জন্য অপেক্ষা করিয়া বসিয়া থাকে না। পরের শ্রাবণেই নিভাননীর বিবাহের দিন স্থির হইয়া গেল। পাড়ার বড় চণ্ডীমণ্ডপটাতে আবার বিস্তৃত বরাসন পাতা হইয়াছে। দুপুরের পর হইতে গ্রামের ছোট ছেলেমেয়েরা জড়ো হইয়া ভিড় করিতেছে। গ্রামসুদ্ধ সবারই আজ চাটুয্যে-বাড়ি নিমন্ত্রণ—সুদ্ধ ব্রাহ্মণ পাড়াটুকু যে তাহা নয়, শূদ্রভদ্র সবারই। কৈলাস ভট্‌চায ব্যস্ত আছেন; কারণ চাটুয্যেদের পুকুরে সব ছোট মাছ বলিয়া মহিমপুরের নিকারীদের মাছের বায়না দেওয়া হইয়াছে, মাছ এখনও আসিয়া পৌঁছায় নাই।

বৈকালে বরের দল আসিল।বরের বাড়ি এদিকেই, গোটাদুই স্টেশন পরেই। ইহাদের আনিতে বরের পাল্কী বাদে খান পাঁচছয় গরুর গাড়িও স্টেশনে গিয়াছিল। বরযাত্রীদের মধ্যে বৃদ্ধের দলই বেশী, দুই একটি বালকও আছে।

মেয়েরা চণ্ডীমণ্ডপের সামনে পথের ধারে বরকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য ভিড় করিয়া দাঁড়াইয়াছিল। মেটে হাঁড়ীর ভিতর দৃষ্টি-প্রদীপ লইয়া কৈলাস ভট্চাযের স্ত্রী অপেক্ষা করিতেছিলেন। চাটুয্যে-গিন্নী একটু পিছনে দাঁড়াইয়াছিলেন।

বরের পাল্কী পাকুড়-তলায় নামাইল।

বর পাল্কী হইতে বাহির হইল। বরকে এ-পর্যন্ত এখানকার কেহ দেখে নাই, বরের জ্যাঠামশাই আসিয়া সব ঠিকঠাক করিয়া গিয়াছিলেন।বয়স চল্লিশের কাছাকাছি হইবে, দোজপক্ষে বিবাহ করিতেছে, এবং খুব ফরসা না হইলেও কালো নয়, বেশ স্বাস্থ্য, মাথার সামনের দিকে একটা ছোট টাক।...

চাটুয্যে-গিন্নী অনেকক্ষণ হইতে একদৃষ্টে পাল্কীর দিকে চাহিয়াছিলেন। ঝি-বউরা উলু দিয়া কলরব করিয়া উঠিলে তাঁহার যেন চমক ভাঙ্গিল। তিনি তো জানিতেন সুরেন আসিতেছে না, আসিতে পারে না—তবুও পাল্কী হইতে সুরেনের পরিবর্তে ইহাকে আসিতে দেখিয়া তিনি নিরাশ হইলেন কেন—কে জানে!